নন ফিকশন
আবার বারমুডা ট্রায়াঙ্গল
মিলন গাঙ্গুলি

আবার বারমুডা ট্রায়াঙ্গল

মিলন গাঙ্গুলী

বারমুডা ট্রায়াঙ্গল আজও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশটা অমীমাংসিত রহস্যের প্রথমটা হয়ে রয়েছে বহুদিন ধরে।

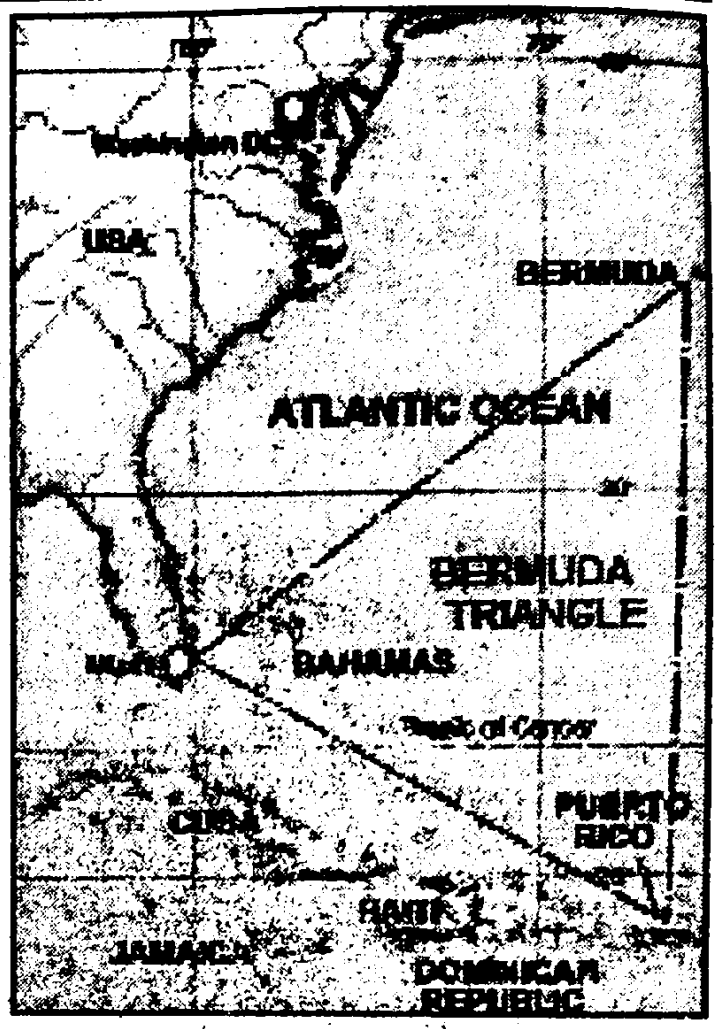

পূর্বকথা

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরের ৫ তারিখ। ফ্লোরিডা।

ফোর্ট লয়ারডেল এয়ার স্টেশন।

চোদ্দজন পাইলট নিয়ে মহড়া দেয়া হবে আকাশে। অপারেশনের নাম ফ্লাইট-১৯। পাঁচটা বোমারু বিমান। এগুলোকে অ্যাভেঞ্জার বিমান বলে। ঘণ্টায় তিনশো মাইল বেগে উড়তে পারে এই বিমানগুলো।

ছোট্ট একটা মহড়া। আরও অনেকবার এরকম করা হয়েছে। রুটিনচেক। চোদ্দজন পাইলট সবাই অভিজ্ঞ। নতুন কেউ নেই দলে।

দুপুর দুটোয় একে একে আকাশে উড়ে গেল বিমানগুলো। কন্ট্রোলটাওয়ারে বসে রইল একজন রেডিওম্যান। বিমানের পাইলটরা তার সাথেই যোগাযোগ করবে। ওরা ঠিক চারটার সময় এয়ার স্টেশনে ফেরত আসবে।

সব ঠিকঠাক। চারটা বাজার কিছুক্ষণ আগেই রেডিওম্যান ভড়কে গেল। কারণ অ্যাভেঞ্জার বিমানগুলোর লিডার লেফটেন্যান্ট চার্লস টেলরের মেসেজ আসছে রেডিওতে।

'এটা একটা জরুরি পরিস্থিতি। আমরা বিপদে পড়েছি। দিক হারিয়ে ফেলেছি আমরা। মাটি দেখতে পাচ্ছি না। নীচের কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

কন্ট্রোল টাওয়ারের সবাই অবাক হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি জানতে চাইল রেডিওম্যান, 'কোথায় আছ তোমরা? তোমাদের অবস্থান জানাও।'

'আমরা কোথায় আছি বলতে পারছি না। সম্ভবত হারিয়ে গেছি আমরা।' জবাব এল।

কন্ট্রোল টাওয়ারের সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। এসব কী বলছে চার্লস টেলর!

'পশ্চিম দিকে প্লেন ঘোরাও। কন্ট্রোলরুম থেকে পরামর্শ দেওয়া হলো অ্যাভেঞ্জার বিমানগুলোর লিডারকে। 'পশ্চিম দিকে সোজা উড়লে বেইজে ফেরত আসতে পারবে।'

'পশ্চিম দিক কোনটা তাই বুঝতে পারছি না। আমাদের সব কম্পাসগুলোই নষ্ট হয়ে

গেছে। বিমানের যন্ত্রপাতিও কাজ করছে না। সূর্য দেখতে পাচ্ছি না। নিচে ওটা মাটি না সমুদ্র তাও বুঝতে পারছি না।'

পুরো ন্যাভাল স্টেশন আর কন্ট্রোলটাওয়ার জুড়ে হুলস্থুল পড়ে গেল! এসব কী হচ্ছে! বাইরে পরিষ্কার রোদ। মাত্র চারটা বাজে। বিমানের পাইলটরা সূর্য দেখতে পাচ্ছে না কেন? সবার কম্পাস একই সাথে নষ্ট হয় কী করে?

এবার পাঁচটা বিমানের পাইলটরা নিজেদের সাথে নিজেরা যোগাযোগ করতে লাগল। বোঝাই যাচ্ছে চরম কোনও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ভয় পেয়ে গেছে পাইলটেরা। আকাশে অনেক ভুতুড়ে ঘটনা হয় বলে এতকাল শুনেছে সবাই। কিন্তু এ রকম কোনও ব্যাপার আগে হয়েছে বলে তো শোনা যায়নি।

যদিও অ্যাভেঞ্জার বিমানগুলোর লিডার ছিলেন চার্লস টেলর। তারপরও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ক্যাপ্টেন জর্জ স্টিভাসের হাতে নেতৃত্ব তুলে দিলেন তিনি। ক্রমাগত নিজেদের বিপদের কাহিনি বর্ণনা করে যাচ্ছেন জর্জ। কন্ট্রোল টাওয়ার আর বেসের সবাই হাঁ করে শুনছে। ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে জর্জের কণ্ঠস্বর। কী বলছেন বোঝা যাচ্ছে না। এক সময় আর শুনতে পাওয়া গেল না।

কন্ট্রোল টাওয়ারের সবগুলো রেডিওর সাহায্যে অ্যাভেঞ্জার বিমানগুলোর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলো। অসংখ্যবার। লাভ হলো না।

বিকেল চারটা পঁচিশ বাজে তখন।

সাথে সাথে কোস্ট গার্ড আর নেভির এক ঝাঁক জাহাজ বেরিয়ে পড়ল বিমানগুলোকে খুঁজতে।

ফোর্ট লয়ারডেল এয়ার স্টেশনের দেড়শো মাইল উত্তরে ব্যানানা রিভার এয়ারস্টেশন। এটা আরও একটা বেস তাদের রেডিওতে একটা মেসেজ পাওয়া গেল বিকেল পাঁচটা পাঁচ মিনিটে। মাত্র দুটো সংকেত। F T । মাত্র দুইবার। সেটা ছিল ফ্লাইট এর সংকেত। পাঁচটা বিমানে কোনও একটা থেকে কেউ পাঠিয়েছে।

সেটাই ছিল শেষ মেসেজ।

ব্যানানা রিভার এয়ার বেসের কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট হ্যারি সংকেত পাওয়া মাত্রই বারো জন দক্ষ বৈমানিকসহ মার্টিন মেরিনার PBS নামে উদ্ধারকারী বিমান নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন। এই মার্টিন মেরিনার PBS বহু বিমান দুর্ঘটনার উদ্ধার কাজে চমৎকার কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

অনেকখানিক জায়গা জুড়ে অনুসন্ধান চালাল ওরা। যেখান থেকে শেষ সংকেত পাঠিয়েছিল ফ্লাইট ১৯, সে জায়গাটা শনাক্ত করার চেষ্টা করল। কাছাকাছি থাকা সবগুলো বেসে নিজেদের রিপোর্ট দিতে লাগল।

হঠাৎ করেই কী হলো কে জানে রিপোর্টে পাঠানো বন্ধ হয়ে গেল মেরিনার PBS থেকে।

পাগল হবার দশা হলো বেসগুলোর কন্ট্রোল রুমের অফিসারদের। চেষ্টা করে যেতে থাকল তারা মেরিনার PBS এর সাথে যোগাযোগ করতে। লাভ হলো না।

আর কোনও রিপোর্ট পাঠাল না মেরিনার। বেসে ফিরেও এল না কোনওদিন।

পাঁচটা বিমান তো হারালোই, ওগুলোকে খুঁজতে গিয়ে উদ্ধারকারী বিমানটাও হারিয়ে গেল।

আশপাশের হাজার হাজার মাইল জায়গা গরু খোঁজার মত খোঁজা হলো। বিমান বা বিমানের কোনও ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল না।

আমেরিকান ন্যাভাল বোর্ড অভ এনকোয়ারি তদন্ত শুরু করল। টানা ছয় মাস অনুসন্ধান করলেন তাঁরা। জমা দিলেন চারশো পাতার রিপোর্ট। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, এটাই তাদের জানা মতে সর্বকালের সর্ব শ্রেষ্ঠ আকাশ রহস্য। ফাইলের মধ্যে বড় বড় করে লেখা হলো–আনসলভড। অর্থাৎ অমীমাংসিত।

ঘটনাটা যেখানে ঘটেছে সেই জায়গাটার একটু বদনামও আছে। জায়গাটা, বারমুডা ট্রায়াঙ্গল।

এক

সাগরে জাহাজ ডুবে যেতে পারে এটা স্বাভাবিক হিসাব। এটা দুঃখজনক দুর্ঘটনা হলেও সবাই জানে, কিছু জাহাজ ফিরে আসবে না দূর সমুদ্র থেকে।

অনেকটা যেন এক মুঠো মার্বেল নিয়ে কোনও শিশু খেলতে গিয়ে বিশাল খেলার মাঠে হারিয়ে ফেলে দু'একটা মার্বেল। বিমান দুর্ঘটনাও হয় হরহামেশাই। নানান কারণে। এটাও মেনে নেয় মানুষ। দুর্ঘটনার উপর কারও হাত থাকে না।

কিন্তু যখন কোনও নির্দিষ্ট একটা এলাকাতে একের পর এক হারিয়ে যেতে থাকে জাহাজ, বিমান আর সাবমেরিন–তখন ব্যাপারটা আর স্বাভাবিক থাকে না। মানুষ নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয়। কী হচ্ছে ওখানে?

দুর্ঘটনা এক জিনিস। আর হারিয়ে যাওয়া অন্য জিনিস। কোনওরকম চিহ্ন না রেখে মানুষজন সহ আস্ত একটা বিমান বা জাহাজ একেবারে হারিয়ে যেতে পারে না। কোনও না কোনও চিহ্ন থাকবেই। এ কেমন অস্বাভাবিক দুর্ঘটনা যেখানে কোনও লাশ পাওয়া যাবে না। ভাঙা কোনও কাঠের টুকরো বা লোহা পাওয়া যাবে না। ডুবে যাওয়া জাহাজ বা বিমান থেকে তেল ভেসে উঠবে না। এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ওরা কোনও রেডিও মেসেজ পর্যন্ত পাঠাতে পারবে না।

যে দু'একটা রেডিও মেসেজ পাঠিয়েছিল বিপদগ্রস্ত বিমান বা জাহাজ থেকে সেগুলোও বড্ড অদ্ভুত। মেসেজগুলোর মূল বিষয় চারটে।

(১) কম্পাস ঠিক মত কাজ করছে না। বন বন করে ঘুরছে।

(২) চারদিকে অদ্ভুত রকম সবুজ কুয়াশা দেখা যাচ্ছে।

(৩) জায়গা চেনা যাচ্ছে না।

(৪) হঠাৎ করেই অশান্ত হয়ে উঠেছে সমুদ্র। ভয়াল ঝড় সৃষ্টি হচ্ছে (যদিও পরে আবহাওয়া দপ্তর থেকে এরকম ঝড়ের কোনও খবর পাওয়া যায়নি)।

এরকম অদ্ভুত কিছু মেসেজ দিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল একের পর এক জাহাজ আর বিমান। কখনওই কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি তাদের। আর এই সব ঘটনাই ঘটেছে আটলান্টিক মহাসাগরের বিশেষ একটা এলাকাতে।

বারমুডা একটা দ্বীপের নাম। ১৫৬৫ সালে স্প্যানিশ নাবিক জুয়ান ডি বারমুডেজ আবিষ্কার করেন দ্বীপটা। এই বারমুডা দ্বীপ থেকে বাহামা ছাড়িয়ে মায়ামী পর্যন্ত লম্বা টান দিন স্কেল দিয়ে। সেখান থেকে আরেকটা টান সোজা পোর্টোরিকো পর্যন্ত এবং আবার ফিরে আসুন বারমুডা দ্বীপ পর্যন্ত। এখন যে ত্রিভুজটা পেলাম সেটাই বারমুডা ট্রায়াঙ্গল।

এখনেই ঘটছে এই রহস্যময় ঘটনাগুলো।

আজকাল এমন মানুষ পাওয়া বেশ দুষ্কর যে কি না বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের নাম শোনেনি।

প্রচুর বই লেখা হয়েছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গল নিয়ে। সবগুলোই বেস্ট সেলার। এর লেখকরা প্রচুর কামিয়েছেন এই বইগুলো লিখে। বানানো হয়েছে অসংখ্যা ফিচার ফিল্ম। হয়েছে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গল আজও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ

দশটা অমীমাংসিত রহস্যের প্রথমটা হয়ে রয়েছে বহুদিন ধরে।

একদল বিজ্ঞানী গম্ভীর মুখে বলছেন, 'সত্যিই রহস্যজনক কিছু রয়েছে সে এলাকায়।'

আরেক দল বিজ্ঞানী বুক ঠুকে বলছেন, 'সব ধাপ্পা, সব গুল। পয়সা কামানোর ধান্ধা।'

কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি হচ্ছে দুই পক্ষের মধ্যে। নতুন নতুন আরও বই বেরুচ্ছে 'বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের রহস্য সমাধান' শিরোনামে। লিখছে যার যা খুশি। ব্যাখ্যা করছে যে যার মত। এমনকী ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলের মত প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত মাঠে নেমে গেছে।

আমেরিকান নেভি পর্যন্ত বলছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ঘটনাগুলো গুজব ছাড়া আর কিছুই না! অথচ তাদের কাছেই রয়েছে বেশ কিছু অমীমাংসিত ফাইল। যে ফাইলে বিস্তারিত রয়েছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গল এলাকা হারিয়ে যাওয়া ওদের বিমান, জাহাজ আর সাবমেরিনের তালিকা।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গল এলাকাতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর ব্যাখা দিতে বিজ্ঞানীরা টেনে আনছেন সব কিছু। কেউ কেউ বলেন, এ এলাকাতে রয়েছে ইলেকট্রোন ম্যাগনেটিক ফিল্ড; যাতে ঢুকলে গায়েব হয়ে যায় জাহাজ বিমান আর সাবমেরিন। কেউ বলেন, ভিনগ্রহের মানুষ এসে এমন কায়দা করে রেখে গেছে যার ফলে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে জাহাজ আর বিমানগুলো। কেউ কেউ এর মধ্যে টেনে আনছেন সাগর তলে বাস করা ভয়াল কোনও সর্বভুক দানবের কথা, যেটা গিলে ফেলত জাহাজ, বিমান আর সাবমেরিনগুলো। যেহেতু সর্বভুক দানবটা মারা গেছে। তাই আজকাল জাহাজ বা বিমান হারাচ্ছে না!

কী অদ্ভুত ব্যাখ্যা!

কেউ কেউ বলেন অন্য ডাইমেনশন বা সময়ের স্রোতের কথা। বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ঐ এলাকা দিয়ে জাহাজ আর বিমানগুলো চলে যায় অন্য ডাইমেনশন বা অতীত অথবা ভবিষ্যৎ কোনও সময়ে।

এমনকী আকাশের সুড়ঙ্গের কথাও বলছেন কোনও কোনও বিজ্ঞানী।

আমাদের এত কিছু জেনে লাভ নেই। সাদামাঠা কিছু ব্যাপার শুনি আমরা প্রথমে, তারপর নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারব বারমুডা ট্রায়াঙ্গল সত্যিই কী অমীমাংসিত কোনও রহস্য, নাকি লেখক আর মিডিয়ার মানুষদের তৈরি করা ভুয়া গালগল্প, ফাঁকতালে পয়সা কামানোর ফন্দি!

দুই

বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের কথা সভ্য মানুষ প্রথম জানতে পারে কলম্বাসের নোটবুক থেকে। ক্রিস্টোফার কলম্বাস ১৪৫১ থেকে ১৫০৬ সাল পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন সাগর থেকে মহাসাগরে। ১৪৯২ সালের ১১ অক্টোবর তাঁর নোট বুকে তিনি লিখেছিলেন অদ্ভুত কিছু অভিজ্ঞতার কথা। কম্পাস কাজ করছিল না তাঁর। হলুদ কুয়াশা দেখেছিলেন। সমুদ্রের বুকে নেচে বেড়াচ্ছে নীল ভৌতিক আলো। জাহাজ চড়ায় আটকে যাচ্ছে অথচ কোথাও স্থলভাগ দেখা যাচ্ছে না। ভয়াল কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাঁর।

'বারমুডা ট্রায়াঙ্গল' শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেন ভিনসেন্ট এইচ, গ্যাডিস নামে এক লেখক। ১৯৬৪ সালের কথা। অদ্ভুত একটা শখ ছিল গ্যাডিস ভদ্রলোকের। পত্রিকার কাটিং জমাতে ভালবাসতেন তিনি। বিচিত্র সব খবরগুলো কেটে একটা ফোল্ডারে জমিয়ে রাখতেন। কী মনে করে দুর্ঘটনায় হারিয়ে যাওয়া জাহাজ আর বিমানের খবরগুলো জমাতে শুরু করলেন হঠাৎ করে। এবং অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, ১৬০৯ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত প্রায় এক হাজারের বেশি জাহাজ আর বিমান হারিয়ে গেছে একের পর এক। কোনও হদিস না রেখে। এবং সবই আটলান্টিক মহাসাগরের একটা বিশেষ এলাকার মধ্যে। তিনি নিজেই ম্যাপ নিয়ে বসে স্কেল নিয়ে জায়গাটা চিহ্নিত করে নাম দিলেন- বারমুডা ট্রায়াঙ্গল। যদিও আরও অনেক আগে থেকেই পুরানো দিনের নাবিকরা এই জায়গাটা সম্পর্কে জানত। বন্দরে ফিরে এসে ভৌতিক অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করত তারা। মাঝ সাগরে হঠাৎ করেই দেখা যায় আগুনের গোলা। সবুজ কুয়াশা। আর কম্পাসের মাতাল আচরণ।

গ্যাডিস ১৯৬৪ সালে 'আরগোসি' নামে এক পত্রিকায় এই সব কথা নিয়ে একটা চমৎকার ফিচার লিখে ফেললেন। ব্যাপারটা সভ্য মানুষের নজরে এল। উৎসাহ বোধ করলেন তিনি। অনেক খেটে খুটে নানান জায়গা থেকে তথ্য জোগাড় করে, পুরানো জাহাজের ক্যাটালগ আর রেকর্ড ঘেঁটে লিখে ফেললেন চমৎকার একটা বইঃ ইনভিজিবল হরাইজন। সেটা ১৯৬৫ সালে।

নড়ে চড়ে বসল সারা দুনিয়ার মানুষ। চমকে উঠল সবাই। তাই তো! জাহাজ আর বিমানগুলো যাচ্ছে কোথায়?

মাঠে নামল অনেকেই।

বের হলো আরও কলজে কাঁপানো কিছু বই। যেমন এন, ডব্লিউ পেনসারের *লিম্ব অব দ্য লস্ট* ১৯৬৯। সালে ভিনসেন্ট এইচ. গ্যাডিসের *ট্রু মিস্ট্রি অব দ্য সি*, ১৯৬৫ সালে চার্লস বাটলিয়ের '*দ্য বারমুডা ট্রায়াঙ্গল*, ১৯৭৪ সালে। সমস্যা হলো বেশির ভাগ বই-ই ফালতু গালগল্পে ভর্তি। তথ্যের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় গাল-গল্পে ঠাসা। তবে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য দিয়ে যে বইটা লেখা হয়েছে সেটা হলো লরেন্স ডেভিস কুসচে নামের এক ভদ্রলোকের লেখা *দ্য বারমুডা ট্রায়াঙ্গল মিস্ট্রি সলভড* নামের বইটা।

মানুষজন উপলব্ধি করতে পারল, সত্যি কিছু একটা হচ্ছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভেতরে। জাহাজ, বিমান হারায়। কিন্তু কোনও হদিস থাকবে না কেন? কোথায় যাচ্ছে ওরা? কী ঘটছে ওদের ভাগ্যে?

দেখা গেল অনেক অমীমাংসিত হারানো রহস্য রয়ে গেছে প্রায় সব কটা দেশের জাহাজ আর বিমান বাহিনীর দপ্তরে। যদিও পৃথিবীর কোনও দেশের কোনও সরকার আজ পর্যন্ত স্বীকার করেনি এ কথা।

তাই যদি হয় তা হলে কেন গোপনে তারা তদন্তে জড়িয়েছিল বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ব্যাপারে?

একথা সত্যি, ১৯৭৪ সালের পর আর কোনও জাহাজ বা বিমান হারিয়ে যায়নি বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভেতরে। প্রতিদিন অসংখ্য বিমান আর জাহাজ আসা যাওয়া করছে আজকাল মায়ামী থেকে পোর্টোরিকো। আর পোর্টোরিকো থেকে বারমুডা দ্বীপে। কই, কিচ্ছু তো হচ্ছে না তাদের? তা হলে? আবার এর মানে এই নয় যে, পরিষ্কার দিনের আলোতে পাঁচটি অ্যাভেঞ্জার বিমান হারিয়ে যাবে আকাশে। তাদের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাদের খুঁজতে যাওয়া বিমানটাও আর ফিরে আসবে না। হারিয়ে যাবার আগে বিমানের অভিজ্ঞ পাইলট কেন কন্ট্রোল টাওয়ারের কাছে রেডিও মেসেজ পাঠাবেঃ 'আমরা হারিয়ে গেছি? মাটি দেখতে পাচ্ছি না। সূর্য দেখতে পাচ্ছি না। নীচে ওটা সমুদ্র কিনা তাও বুঝতে পারছি না। আমাদের কোনও কম্পাসই কাজ করছে না।'

পাঁচটা বিমানের সব কম্পাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল একই সাথে? কীভাবে সম্ভব সেটা? পরিষ্কার আকাশ, ঝড় বৃষ্টির কোনও চিহ্নই ছিল না, তারপরও সূর্য দেখতে পায়নি কেন অ্যাভেঞ্জার বিমানের পাইলটরা?

শেষ মেসেজটা ছিল, 'আমরা পুরোপুরি হারিয়ে গেছি।'

সাথে সাথে বারোজন দক্ষ বৈমানিক নিয়ে মার্টিন মেরিনার PBS বিমাকে পাঠানো হয়েছিল পাঁচটা অ্যাভেঞ্জার বিমানের খোঁজ নিতে। আর সেই বিমানটিও ফিরে আসেনি কখনও।

সর্বকালের সেরা রহস্য হিসাবে তকমা মারা এই ঘটনাগুলো ঘটেছিল সবই বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে। ভুয়া গালগল্প সে সব? আজও কোনও হদিস পাওয়া যায়নি সেসবের!

এ কথা তো সত্যি, মোট একশোর বেশি জাহাজ আর বিমান হারিয়েছে বারমুডা ট্রায়ঙ্গালের ভেতরে। আর এক হাজারের বেশি মানুষ!

তিন

বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের সব বইপত্র আর ফাইলগুলো ঘাঁটলে মাত্র কয়েকটা জিনিস পরিষ্কার হয়ঃ

●অনেক প্রাচীনকালের মানুষ এই এলাকা সম্পর্কে জানত। কেউ শয়তানের বা ভুডু সি বলত।

●প্রথম লেখা রিপোর্ট পাই ক্রিস্টোফার

কলম্বাসের কাছ থেকেই। অদ্ভুত হলুদ আলো, কম্পাস...ইত্যাদি ইত্যাদি। পরবর্তীকালে আধুনিক নাবিক আর বৈমানিকদেরও একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

●পুরো বারমুডা ট্রায়াঙ্গল এলাকাটা মোট ৪,৪০,০০০ মাইল জুড়ে। অর্থাৎ এটা আমেরিকার টেক্সাস, লুইজিয়ানা আর ওকলাহমা পুরো এক সঙ্গে জোড়া লাগালে যা হবে তার চেয়ে বড়।

●বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের সব হারনো কেসগুলো যদি ভুয়াও হয়, তারপরও ১৯৪৫ সালের ফ্লাইট-১৯ ঘটনাটা সবচেয়ে চমকপ্রদ। এক সাথে পাঁচটি প্লেন এবং উদ্ধারের জন্য পাঠানো প্লেন হারানো, মোট সাতাশ জন মানুষসহ। আজও রহস্য।

●বারমুডা ট্রায়াঙ্গল এলাকাতেই পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সাগরের স্রোত রয়েছে। এর নাম-গালফ স্ট্রীম। বয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের তল দিয়ে। যার কারণেই হয়তো সৃষ্টি হয় ভৌতিক কুয়াশা। সামুদ্রিক ঘূর্ণিস্রোত। ভয়াল সব জলস্তম্ভ। সেগুলোই হয়তো গিলে ফেলে জাহাজগুলো। তাহলে বিমানগুলোর কী হলো?

চার

যারা দাবি করে সেগুলো সব সাগরের নীচের ভয়াল কোনও দানবের কাজ, তাদের যুক্তিগুলো বড্ড বেশি দুর্বল। হাস্যকর তো-বটেই!

তাদের কথা অনুসারে অথৈ সমুদ্রের কতটাই বা জানি আমরা? কত কিছুই তো থাকতে পারে সমুদ্রের কালো অন্ধকারের নীচে, যা আমাদের কল্পনাকেও হার মানায়। সমুদ্রের গহীনে এক একটা কাঁকড়া মোটর গাড়ির সমান বড় হয়।

ছয় কোটি বছর আগে সিলাকান্থ নামের যে মাছটা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল পৃথিবী থেকে, সেটা ধরা পড়ে ১৯৩৮ সালে ভারত মহাসাগরে। আজও ওদের বংশধররা টিকে আছে সমুদ্রের গহীনে কোনও পাহাড়ের গুহাতে! তা হলে আরও ধরা পড়ছে না কেন?

তা হলে সত্যিই কি সীসার্পেন্টের মত সরীসৃপ মাছ টিকে ছিল বারমুডা ট্রাঙাঙ্গলের তলদেশে? হঠাৎ উঠে আসত খিদে পেলে?

নাহ্, তা হলে কিছু না কিছু ধ্বংসাবশেষ পেতাম আমরা। টুপ করে গিলে ফেলা হত না বোধ হয় এত উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া বিমানগুলোকে।

সব ঘটনার জন্য সামুদ্রিক ঝড়কেও দায়ী করেন কিছু বিজ্ঞানী। যথেষ্ট যুক্তিতর্ক দিয়েই।

হঠাৎ করেই সৃষ্টি হতে পারে সামুদ্রিক ঝড়গুলো। কোনও আগাম নোটিস না দিয়েই। বিশেষ করে আজও হয় ক্যারাবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের আশপাশে এবং পশ্চিম আটলান্টিকের প্রায় জায়গাতে। দক্ষিণ চীন সাগরের এই সামুদ্রিক ঝড়গুলো তো কিংবদন্তীর মত।

ঝড়ের বর্ণনা শুনলেও কলজে হিম হয়ে আসে।

এই ঝড়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাত্র দশ সেকেণ্ডের মধ্যে তৈরি হতে পারে। শান্ত সমুদ্রের পানি মুহূর্তের মধ্যেই পনেরোতলা দালানের সমান উঁচু হয়ে যেতে পারে। আক্রমণ করতে পারে জাহাজ আর বিমানকে।

সম্ভবত সে জন্যই বিপদে পড়া জাহাজ আর বিমানগুলো বলেছিল আকাশ কালো হয়ে গেছে বা তারা ঝড়ের কবলে পড়েছে। কিন্তু আবহাওয়া দপ্তরের মতে সেদিন কোনও ঝড় ওঠেনি সমুদ্রে। বা বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে সেই

এলাকাতে।

এবং এই ঝড় শান্ত হয়ে যেতে পারে মাত্র কয়েক মুহূর্ত পরেই। দেখে বোঝার কোনও উপায়ই থাকবে না কী ভয়াল সামুদ্রিক ঝড় বয়ে গিয়েছিল একটু আগেই।

তো, আবারও বলতে হচ্ছে, সামুদ্রিক ঝড়ের পর জাহাজের এক টুকরো কাঠ বা তেলের ড্রাম, লাইফবোট কিছুই কি পাওয়া যাবে না?

বিমানগুলোর ব্যাপারেও কিন্তু একই কথা!

পাঁচ

আসলে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ব্যাপারটা আপনি কোন্ চোখে দেখবেন সেটাও অনেকখানি নির্ভর করছে তথ্যগুলো আপনি কোত্থেকে সংগ্রহ করছেন।

আমি নিজে যখন চার্লস বার্টলিয়ের *দ্য বারমুডা ট্রায়াঙ্গল* বইটা পড়লাম তখন মনে হলো সত্যি এ এক ভয়াল রহস্য। আবার লরেন্স ডেভিস কুসচের বইটা পড়লে মনে হয় সবই ধাপ্পা। কারণ ডেভিস কুসচে চমৎকার ভাবে ব্যাখ্য দিয়েছেন সবগুলো রহস্যের। তাঁর মনে নিরপেক্ষ তদন্তের অভাবে তৈরি হয়েছে এসব গালগল্প। তবে একথা সত্যি বারমুডা ট্রায়াঙ্গল এলাকাতে হারিয়ে যাওয়া জাহাজ আর বিমানের তালিকাটা কিন্তু একেবারে ছোট নয়। সংক্ষিপ্ত একটা তালিকা দিই আপনাদের জন্য।

জাহাজ

১৬০৯–দ্য সি ডেঞ্জার। পাল তোলা জাহাজ এটা। হারিয়েছিল বারমুডা দ্বীপের কাছেই।

১৬০৯–সি ডেঞ্জারকে উদ্ধার করতে যাওয়া জাহাজটা একই এলাকায়।

১৭৫০–নুয়েস্ট্রা সেনরা ডি গুয়েভালুপের তিনটে জাহাজ। উত্তর ক্যারোলিনা কোস্টের কাছাকাছি।

১৮১২–পজট্রিয়ট। গলফ স্ট্রীমে।

১৮১৪–ওয়াপস। আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজ।

১৮৪০–রোসালি। ফ্রান্সের জাহাজ। এটা কনটেইনার নিয়ে যাচ্ছিল। শূন্য জাহাজ পাওয়া গেছে। কনটেইনারগুলোও অক্ষত ছিল। নাবিক, ক্রু, ক্যাপ্টেন কাউকেই পাওয়া যায়নি, শূন্য জাহাজটা সাগরে ভাসছিল।

১৮৭২–মেরি ক্যালিস্টি।

১৮৮০–ব্রিটিশ ফ্রিগেট আটলান্টা।

১৯০২–জার্মান বার্ক ফিরিয়া। পরে জাহাজ পাওয়া গেছে। কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায়। নোঙর ছেঁড়া অবস্থায় ভাসছিল। ভেতরের জিনিস সবই আছে। মানুষগুলো শুধু নেই।

১৯০৯–সৌখিন ইয়ট স্প্রে।

১৯১৮–দ্য সাইক্লপস। আমেরিকান নেভির জাহাজ। জ্বালানী বহন করত জাহাজটা।

১৯২৪– রাইফুকুমারু। জাপানি জাহাজ। রেডিওতে সাহায্যের আবেদন পাঠিয়েছিল। উদ্ধারকারী জাহাজ গিয়ে আর খুঁজে পায়নি।

১৯২৫–এস. এস. কটোপ্যাক্সি। চার্লসটন বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করেছিল।

১৯২৬–পোর্ট নোকা। যাত্রাবাহী জাহাজ। কিউবা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল।

১৯৩১–স্টেভেঞ্জার। ৪৩ জন নাবিক সহ। ক্যাট আইল্যাণ্ডের কাছাকাছি এসে বিপদ সংকেত পাঠিয়েছিল। আর হদিস পাওয়া যায়নি পরে।

১৯৩২–জন অ্যাণ্ড মেরি। বারমুডার পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে পরে পাওয়া গিয়েছিল জাহাজটা। আগের মতই। মানুষগুলো নেই।

১৯৩৮–অ্যাংলো অস্ট্রেলিয়ান। ৩৯ জন নাবিকসহ। অ্যাজোরোস দ্বীপের কাছাকাছি এসে বিপদ সংকেত পাঠিয়েছিল। কম্পাস কাজ করছে না। সবুজ কুয়াশা। ইত্যাদি।

১৯৪০–গ্লোরিয়া কলটি। বিলাসবহুল ইয়ট।

১৯৪৪–রুবিকন। কিউবার মালবাহী ভাড়াটে জাহাজ। জাহাজ পাওয়া গিয়েছিল পরে। সব ঠিকঠাক। নাবিকরা নেই। শুধু একটা কুকুর ছিল। বেচারা যদি কথা বলতে পারত!

১০৫৫–ইয়ট কোনিমারা IV। খালি ইয়ট পাওয়া গেছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গল এলাকাতে। নাবিক, ক্রু, যাত্রী কেউ ছিল না।

১৯৫৭–ফ্রেইটার সাঞ্জা।

১৯৫৮–ইয়ট রেনডোক। কী ওয়েস্ট ছাড়ার পর নিখোঁজ।

১৯৬৩–মেরীন সালফার কুইন। ৪২৫ ফুট লম্বা মালবাহী জাহাজ। একেবারেই উধাও। কোনও মেসেজ পাঠায়নি। কোনও বন্দরে পৌছায়নি। মাঝ সাগর থেকে গায়েব।

১৯৬৫–এনচ্যানট্রেস। সাউথ ক্যারিলিয়ান থেকে মায়ামী যাচ্ছিল।

১৯৬৭–উইচক্রাফট। মায়ামী থেকে ফিরছিল।

১৯৬৮–স্করপিয়ন। পারমাণবিক সাবমেরিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটার ভূমিকা ছিল দারুণ। অ্যাজোরোস দ্বীপ থেকে ফিরছিল।

১৯৭০–মিল্টন ল্যাট্রাইডিস। মালবাহী জাহাজ। কোনও খোঁজ নেই। মাঝ সাগরে হঠাৎ হারিয়ে গেছে।

১৯৭৩–অ্যানিটা। ২০,০০০ টনের মালবাহী জাহাজ। সাথে ৩২ জন নাবিক ছিল। কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। কোনও বিপদ সংকেত অথবা রেডিও মেসেজ পাঠায়নি।

বিমান

১৯৪৫–ফ্লাইট ১৯। পাঁচটি অ্যাভেঞ্জার বোমারু বিমান। বিমিনি দ্বীপপুঞ্জ থেকে ফিরছিল। হিস্টোরি চ্যানেলের মতে সর্বকালের সেরা রহস্য।

১৯৪৫–মার্টিন মেরিনার। PBS ফ্লায়িং বোট। উদ্ধারকারী বিমান।

১৯৪৮–স্টার টাইগার। বাণিজ্যিক ভাবে ভাড়ায় খাটা বিমান। অ্যাজোরোস দ্বীপ থেকে বারমুডা ফিরছিল।

১৯৪৯–DC-3 ভাড়াটে বিমান। কোনও হদিস ছাড়াই উধাও।

১৯৫৭–C-45 আমেরিকান আর্মির বিমান।

১৯৫০–স্টার এরিয়েল। যাত্রীবাহী বিমান।

১৯৫০–গ্লোব মাস্টার। আয়ারল্যাণ্ডে ফিরছিল বারমুডা থেকে।

১৯৫২–ইয়র্ক ট্রান্সপোর্ট। জ্যামাইকা থেকে ফিরছিল। ব্রিটিশ বিমান। ৩৯ জন যাত্রীসহ।

১৯৫৪–সুপার কন্টেলেশন। আমেরিকান নেভির বিমান ৪২ জন আরোহীসহ।

১৯৫৬–নেভি মার্টিন পেট্রল সি প্লেন। P5M। বারমুডার কাছাকাছি।

১৯৬২–KB-50। এয়ারফোর্সের তেলবাহী বিমান।

১৯৬২–এয়ারফোর্স টেণ্ডার।

১৯৬২–ধনী এক ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত বিমান।

১৯৬৫–C-119 ফ্লায়িংবক্সার। কার্গো বহন করছিল।

১৯৭১–মাঝারি সাইজের ব্যক্তি মালিকানার বিমান।

১৯৭২–যাত্রীবাহী ফ্লেমিঙ্গো এয়ার লাইনসের একটা বিমান। বিমিনি থেকে যাত্রা করেছিল। কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কখনই উত্তর পাওয়া যায়নি।

এটা পূর্ণাঙ্গ তালিকা নয়। সংক্ষিপ্ত তালিকা। এখানে সেই সব বিমান আর জাহাজের কথা বলা হয়েছে যেগুলো হারিয়ে যাবার ফলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল সেই সময়ে। এগুলো ছাড়াও আরও অসংখ্য জাহাজ আর বিমান হারিয়ে গেছে আটলান্টিক মহাসাগরের ওই এলাকাতে। যেটার নামই বারমুডা ট্রায়াঙ্গল। পাল তোলা জাহাজের আমলের নাবিকরা যেটাকে শয়তানের সাগর বলত। প্রতি বছর এই হারানো জাহাজ আর বিমানের তালিকাটা বড় হয়েছে। পুরানো নথিপত্র ঘেঁটে জানা যাচ্ছে আরও অনেক জাহাজ আর বিমান হারিয়েছিল ওখানে।

এখানে দুটো কথা মনে রাখা দরকার।

(১) কিছু জাহাজ ফেরত পাওয়া গেছে। সবই ঠিকঠাক মত ছিল। শুধু মানুষগুলো অদৃশ্য। ব্যাপারটা রহস্যময়।

(২) এই স্যাটেলাইটের যুগে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আর স্যাটেলাইটের সাহায্যে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের গভীর তলদেশে অসংখ্যবার চিরুনি তল্লাশী চালানো হয়েছে। হারানো জাহাজ বা বিমান পাওয়া তো দূরের কথা, এক টুকরো লোহাও পাওয়া যায়নি।

তর্কটা উঠল তখনই, যখন ১৯৭৪ সালের

পর থেমে গেল জাহাজ আর বিমান হারানো। এদিকে যাঁরাই বারমুডা নিয়ে বই পত্র লিখেছেন তাঁরাই আর্থিকভাবে বেশ সফল হয়েছেন–তখনই একদল দাবি করে বসল, সবই বানানো গল্প। লেখকদের মনগড়া কাহিনি।

অনেক বিজ্ঞানী মাঠে নেমেছেন। তাঁদের মধ্যে চমৎকার কাজ দেখিয়েছেন ডিসকভারি আর ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেলের বিজ্ঞানীদের দলগুলো। এঁদের মধ্যে অনেক বিজ্ঞানী আছেন, যাঁরা দীর্ঘ ৩২ বছর বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন।

মোটামুটি ব্যাপারটা হলো এই, হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই অসংখ্য জাহাজ, বিমান, সাবমেরিন হারিয়েছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গল এলাকাতে। কলম্বাস, থেকে শুরু করে অসংখ্য নাবিকের ভৌতিক অভিজ্ঞতা হয়েছে সমুদ্রের ওই এলাকায়। এবং সব কিছুরই ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যার অতীত কিছুই নয়। মোটামুটি দশটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁরা বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের রহস্যের সমাধান হিসেবে।

আগেই বলেছি, এই সব শুধু ব্যাখ্যাই। প্রমাণের কোনও বালাই নেই। তো, ব্যাখ্যাগুলো কী, কী?

(১) প্রায় ১১,০০০ বছর আগে পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়েছিল বিশাল একটা ধূমকেতু। সমুদ্রের নীচে বেশ বড় একটা এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সেটা। যে জায়গায় পড়েছিল সেটাই আজকের বারামুডা ট্রায়াঙ্গল। ধূমকেতুটা এসেছিল মহাকাশের কোনো অঞ্চল থেকেই। সেটার ভেতরই ছিল অচেনা আর অদ্ভুত ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিকে স্তূপ। আর এরই ফলে নষ্ট হয়ে যেত সব কম্পাস আর ন্যাভিগেশনের সমস্ত যন্ত্রপাতি। তৈরি হত সবুজ কুয়াশা। বিমানের এঞ্জিন কাজ করত না। আর এভাবেই হারিয়ে গেছে সব জাহাজ, বিমান আর সাবমেরিন।

কিন্তু কথা হলো সত্যিই যে সেরকম কোনও ধূমকেতু এসে পড়েছিল পৃথিবীতে যথেষ্ট প্রমাণ কই? আর বারমুডার সমুদ্রের

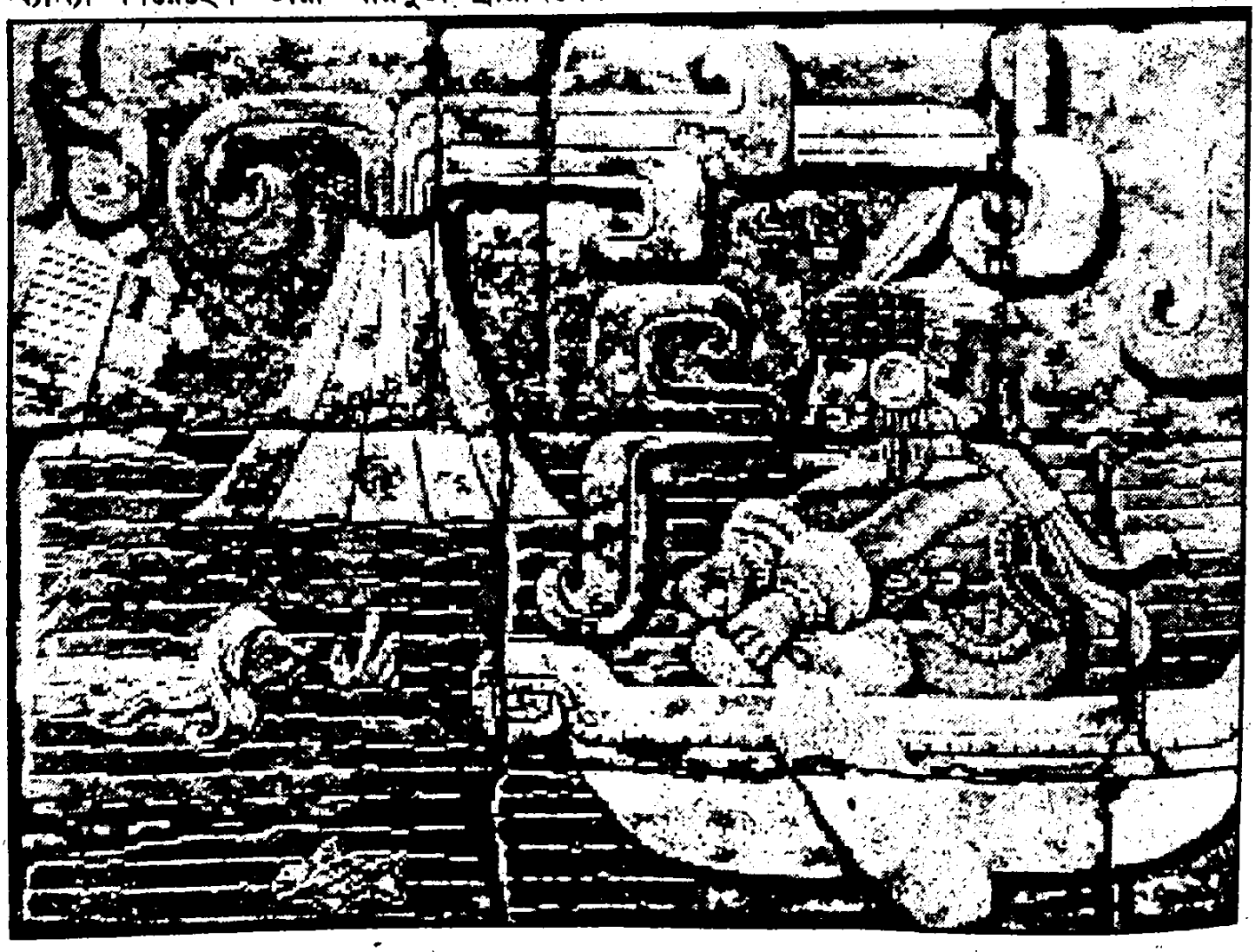

গভীরের খাদগুলো দশ থেকে বারো হাজার ফুট গভীর। সেখানেও ধূমকেতুর অবশিষ্ট কিছু পাওয়া যায়নি।

(২) সব কিছুর জন্য দায়ী বাজে আবহাওয়া। এমত বেশ জনপ্রিয়। ভৌগোলিক কারণেই বারমুড এলাকাতে হঠাৎ করেই রাক্ষুসে সব ঝড় সৃষ্টি হয়। গালফ স্ট্রীমের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। রয়েছে অসংখ্য উষ্ণ স্রোত আর শীতল স্রোত। এই স্রোতগুলোও জায়গা বদল করে সব সময়। দুটো বিপরীত তাপমাত্রার স্রোত যখন মিলিত হয়, মুহূর্তে বদলে যেতে পারে আবহাওয়া। সৃষ্টি হতে পারে ভয়াল সব পানির স্তম্ভ। হারিয়ে যেতে পারে সূর্যের আলো। কয়েক সেকেণ্ডে তৈরি হতে পারে ভুতুড়ে কুয়াশা।

পোর্টোরিকোর সমুদ্রের তলায় রয়েছে শক্তিশালী সব স্রোত। এখানে জাহাজ ডুবলে এখানেই পাওয়া যাবে এমন কোনও কথা নেই। জাহাজ বা বিমানের ধ্বংসাবশেষ পাওয়াও বেশ অসম্ভব ব্যাপার। আর এই জন্যই হয়তো রেডিওতে বিপদ সংকেত পাঠানোর পর আর কখনওই খুঁজে পাওয়া যায়নি ওদের।

তাহলে কিছু জাহাজ এমনিতেই পাওয়া যায় কেন? মানুষজন ছাড়া?

(৩) কোনও দেশের সরকার কোনও রকম পরীক্ষা চালায়নি তো?

হাঁ, এ ব্যাপারেও অনেকে একমত। ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় আমেরিকা বা রাশা এই কাজটা করতে পারে। কোনও সামরিক পরীক্ষা চালিয়েছিল তারা ওই এলাকায়। তারপর পরীক্ষার ফলাফল দেখে ফাইলপত্র চেপে গেছে। কিছু জানতে পারিনি আমরা। আজও যেমন আমেরিকা তাদের গোপন গবেষণা চালাচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোতে।

একথা তো সত্যি, বারমুডার কাছাকাছি, বাহামাতে বিমিনি দ্বীপে এমনকী এনজেস দ্বীপে সেই সময় আমেরিকার নেভি আর বিমানবাহিনীর নানান মহড়া চলত! নতুন নতুন সাবমেরিন, সোনার আর অস্ত্রের পরীক্ষা চালানো হত। গোপন প্রজেক্টের নাম ছিল AUTEC অর্থাৎ 'আটলান্টিক আণ্ডার সি টেস্ট অ্যাণ্ড অ্যাভুলেশন সেন্টার।' ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্টের কথা কে না জানে। সে রকম কেনও পরীক্ষা নয় তো বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের কাহিনি? সেই জন্যই কি এতগুলো বিমান, জাহাজ আর সাবমেরিন হারিয়েও চুপ করে রয়েছে আমেরিকান সরকার?

(৪) একদল অতি বুদ্ধিমান জলদস্যুদের কাজ নয় তো? যারা এ মতের পক্ষে তারা যে থ্রিলার কাহিনির ভক্ত এমন নয়। তবে এটা সত্যি সে সময় ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ আর এই বারমুডা ট্রায়াঙ্গল এলাকাটা ছিল জলদস্যুদের ঘাঁটি। লুকিয়ে থাকার জন্য আদর্শ। ভয়াল সব দস্যু চরিত্র ছিল সে সময়। নীল সাগরের আতংক। তাদের নিয়ে কত গল্প কাহিনি না ছড়িয়ে আছে আজও।

তো, কোনও ভাবে কি বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে একদল জলদস্যু তাদের কর্মযজ্ঞ চালিয়েছিল বছরের পর বছর? জাহাজগুলোর ব্যাপারে মানলাম তা, বিমানগুলো ধরবে কী করে? পরে সেগুলো তো আর সের দরে বিক্রি করেনি! লুটপাটের মালগুলোই বা কোথায়?

এত কিছুর পরও অনেকেরই ধারণা: একদল জলদস্যুর কাজ বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ঘটনাগুলো। তাদের চিন্তায় বাধা দেওয়ার আপনি-আমি কে?

(৫) ভিনগ্রহের প্রাণী দায়ী।

আগেই বলেছি ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাই। সেসময় আলকায়দা সংগঠন ছিল না। নইলে হয়তো ওদেরও দায়ী করতে পারতাম আমরা।

যারা বলছেন বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের এত ঘটনার জন্য ভিনগ্রহের প্রাণীরা দায়ী, তাদের মতে, বিশাল কোনও স্পেসশিপ বছরের পর বছর লুকিয়েছিল ওখানকার সমুদ্রের তলায়। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে এত উন্নত ছিল যে ওরাই তৈরি করত নানান কায়দা। ফলে কম্পাস বিকল হয়ে যেত। রেডিও মেসেজ পাঠাতে পারত নাবিক বা বৈমানিকেরা। দিক হারিয়ে ফেলত।

অনেক সময় এই জন্যই হয়তো মানুষগুলো নিয়ে যেত। শূন্য জাহাজ পড়ে থাকত খোলা সাগরে। এখানে বাধ্য হয়ে একটা কথা বলতে হচ্ছে। বারমুডা এলাকাতে

অসংখ্যবার উড়ন্ত সসার দেখতে পাওয়া গেছে। অনেকেই দেখেছে সেগুলো। এমন কী ডুবুরিরা পর্যন্ত সমুদ্রের তলায় দেখেছে অচেনা আকৃতির সাবমেরিন। যা অন্য কিছুর ইঙ্গিত দেয়!

(৬) সাগর তলের বুদ্ধিমান প্রাণী বা আটলান্টিসের মানুষজন করছে এসব।

গল্পের গরু গাছে ওঠে। কাজেই প্রমাণ যখন লাগবে না নতুন কথা বলতে আপত্তি কী? বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ঘটনার জন্য হারিয়ে যাওয়া সভ্যতা আটলান্টিসের মানুষজনই দায়ী। কারণ ওদের সভ্যতাটা ছিল বারমুডা এলাকাতেই। প্লেটোর বর্ণনা থেকে জানা যায় সেসময় সাঙ্ঘাতিক উন্নত এক সভ্যতা ছিল–আটলান্টিস। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে এত দূর এগিয়ে গিয়েছিল যে অ্যাটম ভাঙতে শিখে গিয়েছিল ওরা।

তারপর নিজেদের অহংকারের জন্যই ধ্বংস হয়ে যায় নিজেরা। এক ঝড়ের রাতে অথৈ সমুদ্রে ডুবে যায় আটলান্টিস সভ্যতা। কিন্তু ধারণা করা হয় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়নি ওরা। টিকে ছিল কিছু মানুষ, ওরাই টিকে আছে আজও সমুদ্রের গহীনে। কল্পনাতীত কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছিল ওরা। হয়তো সে জন্যই দিব্যি বেঁচে আছে। আর ঘটাচ্ছে সব অঘটন।

১৯৭০ সালেই কিছু ডুবুরি বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের সেই এলাকাতে খুঁজে পায় রহস্যময় এক শহরের ধ্বংসাবশেষ। ওটা হতে পারে হারানো আটলান্টিস? ওরা গেল কোথায় তবে?

আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, একদম ফালতু যুক্তি। স্যাটেলাইটের সাহায্যে কিছু পাওয়া গেল না কেন?

ডুবুরিরা বলছে সমুদ্রের নীচে আশ্চর্য একটা পিরামিড দেখতে পেয়েছে। ভাল কথা। একজনও ভিডিও করল না কেন দৃশ্যটা? কম পক্ষে একটা ছবি তো তুলে আনতে পারত?

(৭) ভুল, সবই ভুল। মানে সাধারণ ব্যাপারগুলো ভুল ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে আমাদের সামনে। ফলে আমরা মনে করছি বিরাট কোনও রহস্য রয়ে গেছে ওই এলাকাতে। আসলে তেমন কিচ্ছু না।

অনেক সময় সরল তথ্যগুলো সাজানোর দোষে জটিল হয়ে পড়ে।

ধরুন, একজন মহিলা বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি জানতে চাইলেন, 'বাচ্চাটা তার কে হয়?'

মহিলা বললেন, 'এই বাচ্চার মামা আমার মামাকে মামা বলে ডাকে।'

এখন বলুন বাচ্চাটা মহিলার কী হবে?

কী, মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে? আসলে বাচ্চাটা মহিলার সন্তান। সহজ জিনিসটা কেমন প্যাঁচালো হয়েছিল না সাজানোর দোষে?

বারমুডার ঘটনাগুলোও হয়তো তাই।

ভুল করতে পারে নাবিক বা বৈমানিক। অসংখ্য দ্বীপ আর লেগুন রয়েছে এ এলাকাতে। দেখতে হুবহু এক। সহজেই দিক হারিয়ে ফেলতে পারে কেউ। ঘন কুয়াশা, হঠাৎ তেড়ে আসা ঝড় নাকাল করে ফেলতে পারে নাবিক আর বৈমানিকদের।

একবার ভয় পেয়ে গেলে অথৈ সমুদ্রে বা আকাশে কত কিছুই ঘটতে পারে।

যা কিছু হয়েছে সবই সাদামাঠা দুর্ঘটনা। কারণ বারমুডার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় সত্যিই জাহাজ ডুবির জন্য জায়গাটা একেবারে আদর্শ।

(৮) মিথেন হাইড্রেট। বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের এলাকায় গভীর সমুদ্রের তলায় রয়েছে মিথেন গ্যাস ভর্তি অসংখ্য পকেট। এগুলোই ফাটে দু'একটা, কখনও কখনও গ্যাসগুলোর বুদ্বুদ উপরে উঠে আসে। সৃষ্টি হয় ভৌতিক কুয়াশা। আগুনের গোলা। অন্ধকার রাতে গভীর সমুদ্রে দেখা যায় নীল ভুতুড়ে আলো।

মিথেন গ্যাসের প্রভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে নাবিক আর যাত্রীরা। চেতনা নষ্ট হয়ে যায়। রেডিওতে মেসেজ পাঠাতে ভুলে যায়। অথবা আবোলতাবোল মেসেজ পাঠায়।

গ্যাসের বুদ্বুদগুলো শূন্যে উঠে গ্রাস করে ফেলে বিমানগুলো পর্যন্ত। তারপর?

শুধুমাত্র গ্যাসের চাপে ডুবে যাবে জাহাজ আর বিমান? আপনিই বলুন!

(৯) ম্যাগনেটিক ফিল্ড দায়ী।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গল এলাকাতে কম্পাস যে অস্বাভাবিক আচরণ করে আগেই জেনেছি আমরা। উত্তর আর দক্ষিণ মেরুর উপর দিয়ে বিমান উড়ে যাবার সময়ও একই ঘটনা ঘটে। কাজ করে না কম্পাস। ভুল রিডিং দেয়। আজকাল সবাই জানে সেটা।

সে সময় কিন্তু জানত না কেউ।

পৃথিবীর নিজস্ব ম্যাগনেটিক ফিল্ড সব জায়গাতে একই রকম শক্তিশালী নয়। এবং এটার পরিবর্তনও হয়।

বারমুডা এলাকাতে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হয়তো অন্য রকম ছিল সেসময়। যার ফলে ঘটনাগুলো ঘটত!

আজকাল ন্যাভিগেশন পদ্ধতি কম্পাস আর সামুদ্রিক চার্টগুলো উন্নত হয়েছে, সে জন্য আধুনিক বৈমানিক আর নাবিকেরা বিপদে পড়ছে না আর শয়তানের সাগরে।

(১০) বৈদ্যুতিক কুয়াশা বা সময় সুড়ঙ্গ।

এটা সবচেয়ে টাটকা মতবাদ। একদল বিজ্ঞানী উঠে পড়ে লেগেছেন এই মত প্রতিষ্ঠা করতে।

১৯৭০ সালের কথা। এক বৈমানিক ব্রুস গারনন আর তার বাপ ফিরছিলেন বিমানে করে এনজেস দ্বীপ থেকে বিমিনি দ্বীপে। আকাশের উপরই ভয়াল এক অভিজ্ঞতা হয় তাঁদের।

হঠাৎ করেই অদ্ভুত কুয়াশার ভেতরে ঢুকে পড়ে তাঁদের বিমানটা। পরিষ্কার আকাশ। তারপরও কোত্থেকে যেন তৈরি হলো এই কুয়াশা। কুয়াশা যেন গিলে ফেলতে চাইছিল তাঁদের বিমানটা। কম্পাস পাগলের মত বনবন করে ঘুরছে। বিমানের কোনও যন্ত্রপাতিই কাজ করছে না। চারপাশের কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না ব্রুস। মাটি আকাশ, সমুদ্র কিছুই না। শুধু কুয়াশার একটা সড়ঙ্গ। আর শেষ মাথায় আলো।

রেডিওতে দ্রুত মেসেজ পাঠাতে লাগলেন। কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে কেউ অবশ্য জবাব দেয়নি। ভাগ্যের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিলেন তিনি। বিমানটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না। ওটা উড়ে যাচ্ছিল নিজের ইচ্ছে মত। মনে হচ্ছে কেউ যেন নিয়ন্ত্রণ করছে সব কিছু।

এক সময় শেষ হলো কুয়াশার সুড়ঙ্গ। খোলা আকাশে বের হয়ে পড়ল ব্রুসের বিমান। অবাক হয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন, যেখানে থাকার কথা তারও মাইল খানেক বেশি দূরে চলে এসেছেন তিনি। অথচ যে সময় লাগার কথা তার একশো ভাগের এক ভাগ সময় লেগেছে মাত্র।

বেশ ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। নীচে নেমেই রিপোর্ট করলেন বিমানবন্দরে। কেউ বিশ্বাস করেনি তাঁর কথা, অবিশ্বাসও করেনি। কারণ বহু পুরানো বৈমানিক ব্রুস গারনন। ফালতু কথা বলার লোক নন তিনি।

ব্রুসের ধারণা, সত্যি সত্যিই টাইম ট্রাভেল সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলেন তিনি। আজকে হয়তো লোকজন তাঁর কথা পাত্তা দিচ্ছে না। অদূর ভবিষ্যতে তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হয়তো বদলে যেতে পারে বিজ্ঞানের পুরানো ধ্যান-ধারণা। নতুন কোনও সভ্যতায় প্রবেশ করতে পারি আমরা!

তো, সেই বৈদ্যুতিক কুয়াশা বা সময় সুড়ঙ্গ কি প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্টি হতে পারে? না এগুলো তৈরি হবার জন্য দায়ী ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণী, যারা আড়ালে বসে কলকাঠি নাড়ছে?

ভাল কথা, সব কিছুই সম্ভব বিচিত্র এই পৃথিবীতে!

বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের রহস্যের সমাধান হিসেবে বিজ্ঞানীরা আরও প্রায় দেড় ডজন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সবই মনগড়া। এই দশটাই সবচেয়ে জনপ্রিয়।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ঘটনাগুলো কি সত্যিই এক অমীমাংসিত রহস্য? নাকি সবই গাল-গল্প?

এই সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব আপনার উপর। তবে একথা বলতেই হয়, ওখানে একটা রহস্য ছিল। সাগর তার রহস্য নিজের কাছেই রেখে দিয়েছে।

আজও ফাঁস করেনি! ■

[উৎসর্গ: মাকে। বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভক্ত তিনি।]